ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে........

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে শতাব্দী পুরুষ
আর বেজে উঠবে না চারিপাশে তার
উদার উদ্দত্ত কন্ঠের আবৃত্তি
আর গমগম করে উঠবে না আবৃত্তি পরিষদ
তার দৃপ্ত পদচারনায়
আর মুখর হয়ে উঠবে না কবি সংঘ
তাদের প্রিয় কবির কোলাহলে

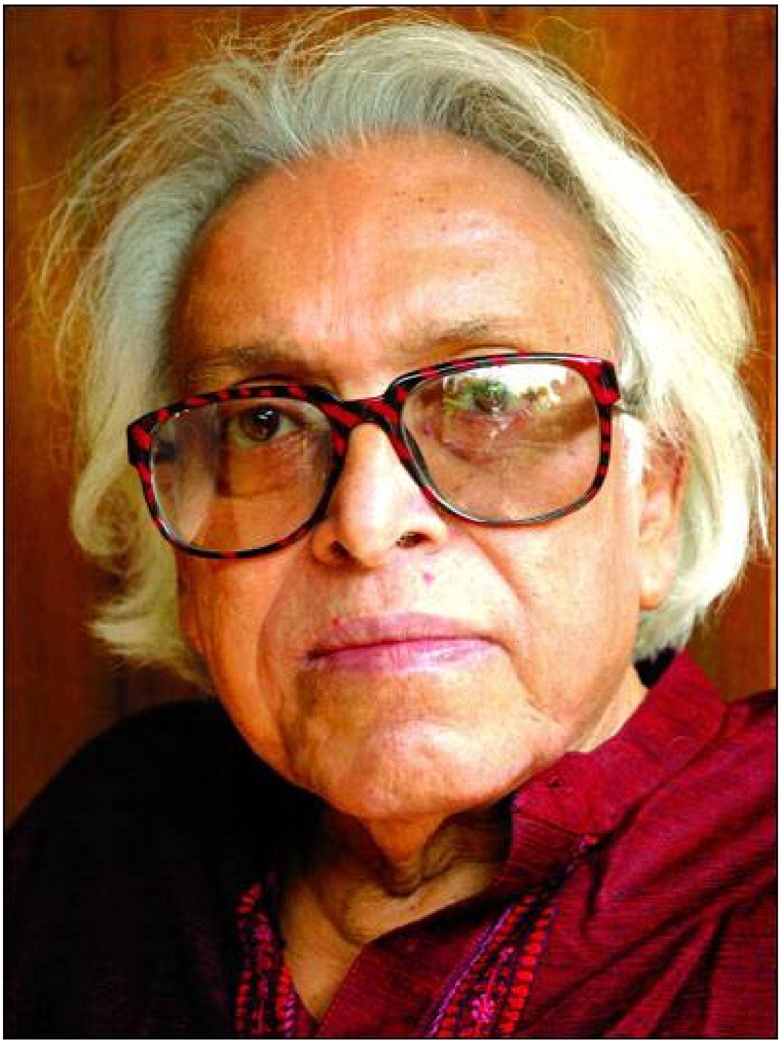

আগস্ট যেনো আমাদের বাঙ্গালীদের স্বজন হারানোর মাস। কি শত্রুতা আছে আগস্ট তোমার সাথে আমাদের বাঙ্গালীদের? একের পর এক এই ক্ষণজন্মা মানুষদের তুমি কেড়ে নিচ্ছো? প্রথমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মুজিবুর রহমান, তারপর শক্তিশালী সমাজ সচেতন লেখক হুমায়ূন আজাদ আর এ বছর আমাদের স্বাধীনতার কবি, বাঙ্গালীর প্রাণের কবি শামসুর রাহমানকে। থামাও তোমার এই কালছোবল আগস্ট, শান্ত হও, আর কতো প্রাণ চাও তুমি? কতো নিয়ে তোমার ক্ষুধা মিটবে? একে একে সবইতো কেড়ে নিয়ে চলছো তুমি পাষানী।

সবসময় পাঞ্জাবী - পায়জামা পড়া, সদা স্মিত হাসি যার মুখে লেগে ছিল সেই শান্ত শিস্ট মানুষটি আর নেই। সংবাদপত্রে তার মারাত্মক অসুস্থতার কথা শুনেই মনটা অচল হয়ে পড়েছিলো। কখনও তার খুব কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু তিনি ছিলেন আমার দূর থেকে দেখা অতি প্রিয় শ্রদ্ধেয় মানুষদের একজন। যেকোন একুশের প্রহর, বৈশাখী ভোর কিংবা কোন জাতীয় শোভাযাত্রা প্রাণ পেতো তার মুখর পদচারনায়। বাংলা সংস্কৃতির প্রত্যেক পড়তে ছিল তার উপস্থিতি। সেই চির সংস্কৃতিমনা বাংলা কবিতার প্রাণ পুরুষ চলে গেলেন, কবিতায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে দিয়ে। বাংলা সাহিত্য আর সমাজকে উজার করে দুহাত ভরে কবিতা দিয়ে নিজে চলে গেলেন রিক্ত হাতে। ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর তিনি জন্মেছিলেন এই ঢাকা নগরীর মাহুতটুলিতে, নানাবাড়িতে। ছোট গল্প দিয়ে লেখালেখির শুরু ছিল কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে স্বভাবজাত প্রতিভার কারণেই কবিতায় নিজেকে ঢেলে দেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু, তার প্রথম জীবনের লেখা কবিতায় আর এক বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের ছোয়া পাওয়া যেতো কিন্তু পরে তিনি কবিতায় নিজস্ব মাত্রা যোগ করেন এবং তৈরী করেন নিজের স্বাতন্ত্র্য ধারা। প্রথম কবিতার বই 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (১৯৬০) প্রকাশ হওয়ার পর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তার প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' (১৯৬৩) জানিয়ে দিলেন তিনি তার নিজস্ব ভঙ্গির উপস্থিতির কথা। কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাসের আচর আবার বদলে দিল নিভৃত কোনে রচনা করা কবির আপন ধারাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবিকে নিয়ে এলো দেশ আর জনতার অঙ্গনে, বদলে দিল কবির চিরচেনা সুরকে, নিভৃতচারী কবি হয়ে গেলেন স্বাধীনতার কবি। একজন সময় ও সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে কবিতায় নিজেকে তুলে ধরলেন। তাই শামসুর রাহমানের কবিতা কালজয়ী, সমসাময়িক কালকে ধরে রেখেছেন তিনি তার কবিতার মাঝে। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যেমন তার কবিতায় আছে, তেমনি আছে স্বৈরাচারের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে শহীদ নূর হোসেনের আত্মত্যাগের কথা, আছে নগর জীবনের মানুষের চির-চেনা সুখ-দুঃখ, আশা-আক-খার কথা, কস্ট - বেদনা, না পাওয়ার ক্ষোভের কথা, ধিক্কারের কথা। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহন না করলেও কবিতা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, প্রেরনা যুগিয়ে গেছেন। জীবিকার জন্য তিনি সরকারি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কিন্তু সামরিক শাসন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাকে ক্ষমতাহীন প্রধান সম্পাদক করা হয় ১৯৮৭ সালে, যার প্রতিবাদে তিনি চাকরী থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর আমৃত্যু সামাজিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক কলাম লিখে জীবিকা অর্জন করেছিলেন। সমাজ সচেতন কবি হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ কন্ঠ ছিল সবসময়ই জাগ্রত, সক্রিয়ভাবে কোন রাজনীতি দলে যোগ না দিলেও কোন শাসক গোষ্ঠীই কবিকে বন্ধু ভাবতেন না। প্রায় পঞ্চাশটির মতো তার কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, এ ছাড়াও তিনি 'অদ্ভুদ আধার এক' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন (১৯৮৯), আমৃত্যু তার জীবনানন্দ (প্রবন্ধগ্রন্থ) সমৃতির শহর (সমৃতিচারী গদ্যগ্রন্থ)। ছোটদের জন্য লিখেছেন এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুড়ো দেবো, গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে নামে বেশ কয়েকটি ছড়ার বই। ছোট বড় সবার কাছেই কবি সমান জনপ্রিয় ছিলেন। অসংখ্য পুরস্কার আর সম্মাননা পেয়েছেন আমাদের প্রিয় কবি তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা একাডেমী পদক (১৯৬৯), একুশে

পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পদক (১৯৯১)। তবে সবচেয়ে বড় পদক ছিল কবির প্রতি মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলাভাষায় সবচেয়ে বেশী কবিতা লিখেছেন আমাদের জাতীয় কবি।

সময় কারো জন্য থেমে থাকে না, একদিন হয়তো সবাই আজকের এই হতবিহ্বল শোক কাটিয়ে উঠবে,কবিকে ছাড়াও আবার হয়তো শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট অমর একুশের অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করবে। কোন এক টগবগে নবীন গলায় শতাব্দীর বিদ্রোহ এনে জ্বলজ্বলে কন্ঠে হয়তো আবৃত্তি করবে ‘তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ কিংবা আবৃত্তি করবে ‘এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা’। কিংবা কোন শ্রাবন সন্ধ্যায় অঝোরে যখন বৃষ্টির ধারা ঝরবে লাজুক প্রেমিক তার প্রেমিকার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে গাঢ় স্বরে বলবে, ‘যখন তোমার পায়রা-হাতে হাতটা রেখে ডুবে থাকি স্বর্গসুখে, তখন কোন গোলটেবিলে দাবার ছকে শ্বেত পায়রাটা মরছে ধুকে’। কোন অভিমানী দেশপ্রেমিক স্বৈরাচারকে অভিশাপ দিবে, বলবে ‘যারা গনহত্যা করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে, আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক পশু সেই সব পশুদের।’ যখন কেউ ভীষন দুঃখ পাবে উদাস হবে বলবে, ‘আমাদের বারান্দায় ঘরের চৌকাঠে কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে, দুঃখ তার লেখে নাম।’। উদভ্রান্ত কোন তরুন বা তরুনী জীবনের কোন অসংলগ্ন মূহুর্তে হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবে এই ভাষায়, ‘সত্য থেকে সঠিক ক’গজ দূরে আমার সংশয়ী পদক্ষেপ? তাহ’লে বিশ্বস্ত ক্ষুর গলায় ছোয়ালে অথবা ক’ফোটা বিষ কন্ঠ বেয়ে নেমে গেলে এই জঠরের পাকে পাকে, পার্থক্যের কী জটিল সূত্র উন্মোচিত হবে পরিনামে?’ কোন রাস্তার ভিখারী দোকানদারের তাড়া খেয়ে হয়তো মনে মনে আওড়ায়, ‘আস্তাকুড়ে বেছে নে আস্তানা, খেলনা ফেলনা নয়’। হয়ত কোন কিশোর রোদজ্বালা মধ্যদুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাতা পেনসিল হাতে নিয়ে কবিতাকে নিজের খাতায় বন্দী করার আশায় তোমাকেই অনুকরন করবে কবি, ‘ডেকেছি কতদিন ওদের নানা নাম ধ’রে, ডেকে ডেকে হারিয়ে গেছ ডাগর জ্যোৎস্নায়। হারিয়ে যাওয়া কিশোর, প্রাণপনে তোমাকে ডাকি, তুমি সাড়া দিলে না।’ তরুন সমাজ পিতৃপুরুষদেরকে বন্দনা করবে, ‘হে পিতৃপুরুষবর্গ তোমরা মহৎ ছিলে জানি, রূপদক্ষ কীর্তির প্রভাবে আজো প্রাতঃস্মরণীয়’ কিংবা বাংলা কবিতার প্রতি তোমার মমতা স্মরণ করা হবে, ‘না, আমি নিন্দুক নই। তুমিতো জানোই কী আনন্দে তোমার সান্নিধ্য চাই, একনিষ্ঠ প্রেমিকের মতো বসে থাকি, তোমারই বাগানে।’ আবহমান কাল ধরে যতদিন এই বাঙ্গালী কাদবে, হাসবে, দুঃখ পাবে, ভালোবাসবে অভিশাপ দিবে কবি তুমি বেচে রবে তাদের আত্মায়, তাদের ভাষায়। অনেক দূরে থেকেও অনেক কাছে থাকবে তুমি আমাদের। এমন কোন একুশের কবিতা উৎসব, স্বাধীনতার কবিতা উৎসব কিংবা জাতীয় কবিতা উৎসব উদযাপন হবে না, দেশে কিংবা বিদেশে যেখানে তোমার কবিতা আবৃত্তি হবে না কবি। যেখানে বাংলাদেশের কবিতার আলোচনা হবে সেখানেই তোমার নাম থাকবে।

এই সুবিধাবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অনেক নামী দামী জনেরা যখন নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন অবলীলায় সামান্য বেশী সুযোগ-সুবিধা আর পয়সার কাছে সেখানে শামসুর রাহমান ছিলেন অবিচল, বিবেকের কাছে, জাতীর কাছে দায়বদ্ধ। মানুষকে ভালোবাসতেন তিনি, মানুষের সুবিধা - অসুবিধার দিকে ছিল তার সজাগ দৃষ্টি, কখনও কোন ব্যাপারে কাউকে কষ্ট দিতে চাইতেন না তিনি, তিনি লিখে গেছেন তার কবিতায়ও সেকথা,

যেদিন মরব আমি, সেদিন কি বার হবে, বলা মুশকিল

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে

শুক্রবার, বুধবার, শনিবার, নাকি রবিবার?
যেবারই হোক,
সেদিন বর্ষায় যেন না ভেজে শহর, যেন ঘিনঘিনে কাদা
না জমে গলির মোড়ে। সেদিন ভাসলে পথঘাট,
পূন্যবান শবানুগামীরা বড় বিরক্ত হবেন

মৃত্যুকালেও কাউকে কষ্ট দিতে চাননি তিনি, তার শবযাত্রায়ও যেনো কারো কস্ট না হয় সে প্রার্থনাও রেখে গেছেন কবি।। কিন্তু কবি যে এতো তাড়াতাড়ি মৃত্যু বরন করতে চাননি, প্রিয়জনদেরকে বলতেন আমি আরো অনেক অনেক দিন বাচতে চাই, আমার যে আরো অনেক কবিতা লেখার আছে। নিষ্ঠুর নিয়তি শুনলো না কবির এই আবদার, কেড়ে নিয়ে গেলো আমাদের সবার কাছ থেকে তাকে নির্মম হাতে।

দুর্ভাগা এই রাস্ট্র যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নি এই কিংবদন্তী পুরুষকে, তাতে কি হয়েছে? মানুষের ভালোবাসা কি তাতে থেমে থাকে? শহীদ মিনারে হাজার হাজার মানূষের ঢল নেমে ছিলো তাদের প্রাণের কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে, সেই বাধ ভাঙ্গা প্রাণের জোয়ারই হোক কবির পাথেয়। সেই জোয়ার নিশব্দে ডেকে বলেছে তুমি যাও, আমরা আছি, আমরা তোমাকে ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না.......... মহাপুরুষরা অমর, তারা যুগে যুগে বিভিন্ন রুপে ফিরে আসেন, তাদের মৃত্যু নেই, তাদের ক্ষয় নেই। দেশ থেকে আজ আমরা যতদূরেই থাকি, বাংলা তুমি আছো আমাদের চেতনায়, আমাদের নিঃশ্বাসে।

মহান কবির জন্মদিনে

তানবীরা তালুকদার
নেদারল্যান্ডস
২৪।০৮।০৬

তথ্যসূত্রঃ

দৈনিক প্রথম আলো
দৈনিক জনকণ্ঠ
দৈনিক যুগান্তর
হুমায়ূন আজাদ সম্পাদিত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’